ISSN 2227-1635
**বাঙলা সাহিত্যিকী** ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

# প্রাচীন বাংলার নগর ও জনপদ

*ড. আবু নোমান মো. আসাদুল্লাহ

**সারসংক্ষেপ:** বাংলা প্রাচীন একটি ভূখণ্ড। এ ভূখণ্ডে মনুষ্য বসবাসযোগ্য অঞ্চল হওয়ার ইতিহাস ঘটনা বহুল। হিমালয় বাহিত পলিসঞ্চয়ের ফলে একটি বিস্তৃত অবতল ভূমি গড়ে ওঠে, সেটিই পরবর্তীতে বাংলা নামে অভিহিত হয়। তবেপূর্ব থেকেই বাংলা নামটি এ অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা। ধারণা করা যায় যে, দশ থেকে পনেরো হাজার বছর পূর্বেও বাংলায় মানুষের অস্তিত্ব ছিল। তবে বাংলা ভাষা-ভাষী এতদঞ্চলের আদিম মানুষদেরকে অষ্ট্রিক বা আদি অষ্ট্রালয়েড বলা হতো। এ প্রবন্ধে বাংলার প্রাচীন ভূ-খণ্ডের শুরু থেকে এর ধারাবাহিক উৎকর্ষ ও বিকাশের ইতিহাস বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার সীমা-পরিসীমা, জলবায়ু আবহাওয়া, নদনদী, পাহাড়, প্রকৃতি ও ধারাবাহিক শাসন ধারা বিস্তৃত বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য এ প্রবন্ধের আলোচনা থেকে বাংলার উৎপত্তি, জনপদ, নগর, জনপদের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ সম্পর্কে একটি সনির্বন্ধ ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলার একটা বিরাট অংশ এক সময় গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালে সেই সমুদ্রের নাম ছিল আসাম উপসাগর। ভূবিজ্ঞানী ইমুয়েসের মতে গিরিজনি আলোড়নের আঘাতে উত্তর দিকে গতিশীল দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ অবনমিত হয়। হিমালয় থেকে আসা নদীবাহিত পলি সঞ্চয়ের ফলে এখানে গোলাকার খাতের মত প্লাবন সমভূমি গড়ে উঠে। এটা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম অবতলভূমি যা বঙ্গখাত হিসেবে পরিচিত ছিল।[১] বঙ্গখাতের উত্তরে শিলং মালভূমি, পশ্চিমে ভারতের সুদৃঢ় ভূমি, পূর্বে নাগালুসাই ভাঁজ পর্বত এবং দক্ষিণ অংশ বঙ্গোপসাগরের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা এই বঙ্গোখাতেরই বৃহত্তম অংশ বলে ধারণা করা হয়। বঙ্গোখাতের বিভিন্ন জায়গা খুঁড়ে এবং জরিপ করে দেখা গেছে এখানকার সব শিলাই প্রাচীন অথবা নতুন পলল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা বাদে বাকি সম্পূর্ণ অংশ প্লাবন সমভূমি। প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পুরাজীবীয় (পোলিওজোইক) যুগে এখানকার আবহাওয়া আরও উষ্ণ ও আর্দ্র ছিল। তখন এখানে প্রচুর গাছ জন্মে, এছাড়া বিভিন্ন প্রাণীরও অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। এই সম্পর্কে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক কোনো তথ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটি তাত্ত্বিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে কার্বনিফেরাস যুগে ভূ-আলোড়নের প্রভাবে এখানকার প্রাণী আর গাছপালা মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। কালক্রমে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ কয়লায় পরিণত হয়। সে হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলে মাটির কয়েক হাজার ফুট নিচে কয়লার স্তর রয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। দিনাজপুরে ইতোমধ্যে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভুমির রূপ বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনারের মহাদেশ সঞ্চলন মতবাদ অনুসারে মধ্যজীবীয় বা মেসোজোইক মহাযুগের ট্রিয়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটোশিয়াম অধিযুগে সম্মিলিত ভূখণ্ড প্যাঞ্জিয়ার গণ্ডোয়ানা নামক দক্ষিণ ভূখণ্ডের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। গণ্ডোয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্য উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নবজীবীয় (সেনোজোইক) মহাযুগের কোয়ার্টার অধিযুগে প্লেইস্টোসিন (হিমযুগ) পর্বে ভারতীয়

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

উপদ্বীপ এশিয়ার সাথে যুক্ত হলেও ইতঃপূর্বে টেসিস সাগর থেকে উত্থিত হিমালয় পর্বত এবং দাক্ষিণাত্যের মাঝামাঝি অংশ বিরাট খাত থেকে যায়।

উত্তরের লরেশিয়া ও দক্ষিণের গণ্ডোয়ানা থেকে আগত ছোট-বড় নদী দ্বারা বাহিত পলিরাশিতে এই খাতের পশ্চিমাংশ অত্যন্ত দ্রুত ভরাট হয়ে যায়। সিন্ধু-গঙ্গা খাত নামে পরিচিত খাতের পূর্বাংশ কেবলমাত্র লরেশিয়া থেকে আগত ছোট ছোট নদীবাহিত পলিরাশি দ্বারা ধীরে ধীরে ভরাট হতে থাকে।[২] ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর পূর্বে বাংলার ভূ-ভাগ গড়ে উঠেছিল। বাংলার ভূমিতে সে যুগের কোনো নরকংকাল পাওয়া যায়নি। তবে মানুষ নির্মিত অনেক অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে। প্রত্নপলীয় যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয় দশ-পনের হাজার বছর পূর্বেও বাংলায় মানুষের অস্তিত্ব ছিল। বাংলা ভাষাভাষি আদিম অধিবাসীদের অষ্ট্রিক বা আদি অস্ট্রালয়েড বলা হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দ্রাবিড় ভাষাভাষি নরগোষ্ঠী প্রথম বাংলায় অনুপ্রবেশ করে।[৩] এই দ্রাবিড় গোত্রকে বঙগোত্র হিসেবে অনুমান করা হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতে একজন বঙ্গ নামক রাজা ছিলেন। মহাভারতেও বঙ্গ রাজার উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গ ভূখণ্ডের উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদে বঙ্গ জাতির উল্লেখ রয়েছে। এরা আর্যদের যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।[৪] বঙ্গ রাজাই সম্ভবতঃ বঙ্গভূমির গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ বহু প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় কিন্তু তা স্থান হিসেবে নয় জাতি হিসেবে। সম্ভবত বঙ রাজা শাসিত জাতি বংশানুক্রমে যেখানে বসবাস করেছে সে স্থানই বঙ্গ নাম ধারণ করেছে।

*ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে বঙ্গ জনপদবাসিদের পুণ্ড্র নামে অভিহিত করা হতো।[৬] পুণ্ড্ররা যে বর্তমান উত্তর বাংলার অধিবাসী ছিল এবং সে অঞ্চলটি যে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদেশ নামে পরিচিত ছিল এ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতরাও একমত। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষিবিশেষের জাত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বঙ্গ ছাড়াও বগধ, চের ও পাদা শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

*বোধায়ন ধর্মসূত্রে* বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। *বোধায়ন ধর্মসূত্রে* ভূখণ্ড বা জনপদগুলোকে আর্যদের পবিত্রতার আলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা- সর্ব নিকৃষ্ট অংশে বঙ্গ এবং কলিঙ্গসহ কয়েকটি ভূখণ্ডের নাম করা হয়েছে। এই নিকৃষ্ট এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাস করলেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।[৭] পুরাণেও বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র ইত্যাদি অঞ্চলের প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে।[৮]

রামায়ণেও বঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় বঙ্গকে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে, পক্ষিবিশেষের জাত হিসেবে বাঙালিদের প্রথমত তিরস্কার করা হলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সম্মানিত জাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৯] মহাভারতেও বঙ্গ নামের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে দেখা যায় যে, বঙ্গ একটি 'পূর্বাঞ্চলীয় দেশ এবং এটি ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমে অবস্থিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের 'শ্বেত-স্নিগ্ধ' সুতি বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে বলা হয়েছে যে, রঘু সুহ্মদের উৎখাত করেন এবং বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গের সম্মিলিত রণতরীগুলোকে পরাজিত করেন এবং গঙ্গার দ্বীপপুঞ্জে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই গ্রন্থে বঙ্গকে 'গঙ্গাস্রোত হস্তহরেষু' বা গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী স্থান রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

সেনরাজ বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া লিপি এবং কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে বঙ্গের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। 'বৃহৎ সংহিতা'য় উপবঙ্গ জনপদের উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তৎসংলগ্ন বনভূমি বা সুন্দরবনাঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ধারণা দেয়া হয়েছে উপবঙ্গ বঙ্গেরই অংশবিশেষ।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ষটপঞ্চাশদ্দেশ বিভাগ-এ সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে বঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ব্রহ্মপুত্র বলতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে বুঝানো হয়েছে। বর্ণনা ও সূত্র মোতাবেক এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজের তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, পশ্চিমে ভাগিরথী, পূর্ব-উত্তরে করতোয়া নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ড নিয়ে প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[১০] আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমে বঙ্গ শব্দটি এক রাজা 'বঙ্গ' নামানুসারে পাওয়া গেছে। অতঃপর উক্ত রাজার রাজ্যের প্রজাগণকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হতো। পরবর্তীতে এটি ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।[১১]

বাংলা নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু 'আল' বেঁধে বন্যার পানি থেকে তাদের জমির ফসল রক্ষা করতো। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে (বঙ্গ+আল) বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[১২]

কেউ কেউ মনে করেন হযরত নূহ (আ:) এর অধঃস্তন পুরুষ হিন্দের পুত্র বঙ-এর সন্তানরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। বাংলা ছিল নিচু অঞ্চল। বাংলার প্রধানরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে প্রায় দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত প্রশস্ত আল বা স্তুপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি নির্মাণ করে চাষবাস করতেন। কালক্রমে এ অঞ্চলের নামকরণ হয় বাঙ্গালা।[১৩] এদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল সেমিটিক দ্রাবিড়। এদের মধ্য এশিয়া থেকে আগমন ঘটেছিল বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত সূত্র যৌক্তিক বলেই বিবেচনা করা যেতে পারে।

রামেশচন্দ্র মজুমদার উপরিউক্ত যুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি আলাদা স্থান।[১৪] তবে প্রাচীন বঙ্গ ও বঙ্গালের দুটি আলাদা সীমারেখা তিনিও চিহ্নিত করতে পারেননি। প্রাচীন বঙ্গ বা বাঙ্গালা বহু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এর এক এক অংশ এক এক নামে পরিচিত ছিল। এর প্রত্যেক অংশ জনপদ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই জনপদগুলো হলো- গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রদ্বীপ ও বাংলা। মুসলমানদের লক্ষণাবতী বিজয়ের পূর্বে একটি অঞ্চল ছিল বঙ বা বাঙ এবং এটি গঙ্গার পূর্বদিকে ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল বলে অনুমান করা যায়।[১৫] বঙ্গের দক্ষিণ সীমা ছিল বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ছিল ব্রহ্মপুত্র বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬]

পুণ্ড্র হচ্ছে প্রাচীন বঙ্গের প্রভাবশালী একটি জনপদ যা বৈদিক যুগে ঐতরেয় মুনি দ্বারা কৃত ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] উক্ত গ্রন্থে পুণ্ড্রদের দেশকে প্রাচ্যদেশীয় ও পূর্বপ্রান্তিক বলা হয়েছে। মহাভারতেও পুণ্ড্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের দিগ্বিজয়পর্বে ভীমের পূর্বাঞ্চলীয় অভিযান কালে মোদাগিরি (মুঙ্গের) রাজকে হত্যা করে পুণ্ড্র ও কৌশিক কচ্ছদের জয় করে বঙ্গের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে মুঙ্গেরের পূর্বে পুণ্ড্রদের অবস্থান বলে ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে পুণ্ড্রের সঙ্গে আরও কয়েকটি

স্থানের নাম বলা হয়েছে, সেগুলো হলো- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম।[১৮] পুরাণসমূহে পূর্বদেশে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে পুণ্ড্রদের উল্লেখ রয়েছে।[১৯] বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়'ও পুণ্ড্রদের পূর্বদেশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০] পুণ্ড্র জনপদ বা পৌণ্ড্রদেশ অতীতের উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমে কুশী (কুশী গঙ্গ) দক্ষিণে গঙ্গা নদী ও পূর্বে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

মহাভারতের আদিপর্বে বঙ্গ জনপদকে পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ দেশের সঙ্গে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান কর যায়, দেশগুলো পরস্পর প্রতিবেশী। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পূর্বাভিমুখী অভিযান ও দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাভারতে যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে পৌণ্ড্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[২১]

বঙ্গরাজা হর্ষবর্ধন ও কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেন। তাঁর এ ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে মগধ ছাড়াও পূর্বভারত হিরণ্যপর্বত (বর্তমান মুঙ্গের), অঙ্গ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। চম্পা নগরী ছিল অঙ্গ জনপদের রাজধানী। হিরণ্যপর্বত, অঙ্গ ও কামরূপ ছাড়াও আরো চারটি জনপদ বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার আওতাধীন ছিল। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতে বঙ্গ জনপদের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত এ সময়ে বঙ্গ জনপদ তার স্বাধীনতা হারিয়ে অন্য কোনো জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে হিউয়েন সাঙ নৌপথে, পুণ্ড্রবর্ধনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কুড়িটির মত সংঘারাম দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনামতে সেখানে তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর বসবাস ছিল। তিনি দেখেছেন প্রায় একশতটির মত। সংঘারামের আঙিনাগুলো ছিল আলো ঝলো-মলো, গম্বুজ ও মণ্ডপগুলো ছিল খুবই উঁচু। এখানে সাতশত জনের মত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছিলেন বলে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছেন।[২২] হিউয়েন সাঙের পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, "তিনি (হিউয়েন সাঙ) বিহার হইতে গঙ্গাতীর দিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। কিন্তু ঐ দেশের স্বাধীন রাজার বংশ বহু শতাব্দী পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল এবং এটি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অধীন ছিল। বঙ্গদেশ তখন পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যথা পৌণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, কামরূপ বা আসাম, সমতট ও পুর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রোপকূল অঞ্চল।"[২৩] উক্ত মন্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে প্রাচীন বঙ্গ জনপদের মূল অংশ সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আরো দেখা যায় যে, তিনি অঙ্গরাজ্য অতিক্রম করে পৌণ্ড্রদেশে উপনীত হন এবং পরে একটি বিশাল নদী "কালাতু"[২৪] পার হয়ে কামরূপে উপনীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কালাতু নদী ছিল কামরূপ এবং পৌণ্ড্রদেশের প্রাচীন সীমারেখা। নীহাররঞ্জন রায় এই ধারণার সঙ্গে একমত।[২৫] কুশী বা কৌশিক নদী এবং করতোয়া মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী। রামচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীর (অর্থাৎ পুণ্ড্রের) অবস্থান গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের অবস্থান বিষয়ে নিম্নোক্ত-কবিতা রচনা করেছেন:

পুরব দিকেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানী।
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানী।
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।

সে দেশে কবয়ে কৃপা কামাখ্যা মঙ্গলা ॥
মধ্য দিয়া বহি যায় করি টল টল।
করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট।
পরশুরামের আছে সেখানেতে পাট ॥
** ** **
এই সীমার মাঝে দেশ পেঠন 'দুয়ার থিতি'
এই দেশে আমার জাতির বসতি ॥"[২৬]

বর্ণনার প্রেক্ষিতে পুণ্ড্রদেশ জনপদের অবস্থিতি সম্পর্কে একটি আস্থাপূর্ণ সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত চমৎকার। হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী রাজ্যের ভূমি ছিল সমতল, চিক্কন ও উর্বরা। এখানে সকল ধরনের ফসলই পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হতো। কাঁঠাল এখানের বিখ্যাত ফসল। স্থানটির পরিধি ছিল ৮০০ মাইল। এখানে ৭০টি বিহার বা সংঘবায় ছিল এবং এসব বিহারে প্রায় তিন শতাধিক বৌদ্ধ বসবাস করতো। এখানে শত শত দেবমন্দির ছিল যেখানে নানা জাত ও সম্প্রদায়ের জনগণ একত্রিত হতো। এখানকার জনসংখ্যা ছিল অত্যধিক। রাজভবন বেশ দর্শনীয় ছিল। সুন্দর জলাশয় এবং পুষ্পোদ্যান ছিল সুবিন্যস্ত।[২৭] হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বিবরণীতেও পুণ্ড্রনগরের এ সমস্ত সৌন্দর্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, পুণ্ড্রনগর প্রাচীনকাল থেকেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত, "সুদূর অতীত থেকে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্রনগর শুধু প্রধান শাসনকেন্দ্র রূপেই নয়, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং অখণ্ড ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থল পথ বাণিজ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপেও স্থান অধিকার করেছিল।"[২৮]

বর্তমান মহাস্থানগড় পূর্বোক্ত পুণ্ড্রনগর ছিল বলে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই একমত। মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত পুন্দনগল, সন্ধ্যাকর নন্দীর পৌণ্ড্র-বর্ধনপুর, হিউয়েন সাঙের 'পুন-ন-ফ-তন্-ন' এক ও অভিন্ন এবং তা যে পুণ্ড্রনগর তাও প্রায় নিশ্চিত। প্রাচীন সাহিত্যাদির বর্ণনা, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর প্রতিবেদন, অষ্টাদশ শতকের লোককবি রতিরাম কর্তৃক তাঁর কাব্যে এই ঐতিহ্য রক্ষণ এবং সাম্প্রতিককালে মহাস্থানগড়ে প্রত্নখননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন ও প্রাচীন কীর্তির অবশেষ থেকেও তা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ইতঃপূর্বে বঙ্গদেশ হিসেবে বঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন বঙ্গদেশের উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষুদ্র জনপদ হচ্ছে বঙ্গ। এখানে বঙ্গ বলতে সামগ্রিক বাংলার একটি ক্ষুদ্র অংশকে বুঝানো হচ্ছে। মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ হতেও অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গ সামগ্রিক বাংলার একটি বিভাগ। লাখণাবতী টাকশাল হতে প্রবর্তিত রুকন আল-দীন কায়কাউস[২৯] ও জালাল আল-দীন মুহাম্মদ শাহের[৩০] মুদ্রায় খোদিত (মিন খারাজে বানক) বা বঙ্গের খারাজ হতে মুদ্রিত অংশটি প্রমাণ করে যে, বঙ্গ বৃহত্তর বাংলার সামগ্রিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে নির্দেশ করে। বঙ্গ পুণ্ড্রের মত ততটা প্রসিদ্ধ না হলেও বঙ্গের কথাও প্রাচীন সাহিত্য ও গ্রন্থাদিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ঐতরেয় আরণ্য'কে উদ্ধৃত 'বঙ্গের কথাও ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত ও হরিবংশেও বঙ্গ প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণেও এ প্রসঙ্গ উল্লিখিত। এসব সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন বঙ্গ জনপদ পুণ্ড্র জনপদের প্রতিবেশী জনপদ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচ্য জনপদ তথা পুণ্ড্র, গৌড়, কামরূপ ইত্যাদির সঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এতে কার্পাস বস্ত্র বা বয়নশিল্পের জন্য বঙ্গ

বিখ্যাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহমিহির (আ: ৫০০-৫৫০) তাঁর *বৃহৎসংহিত*' গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গদেশের অন্তর্গত যে ক'টি জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো- গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, বর্ধমান, তাম্রলিপ্তি, সমতট ও উপবঙ্গ।

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মহাকবি কালিদাস রচিত *রঘুবংশ* কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে 'বঙ্গ' জয়ের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা থেকে কালিদাসের সমকালীন বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পাল ও সেন রাজত্বকালে বঙ্গকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকলেও, গুপ্তযুগে বঙ্গ ও পুণ্ড্র দুটি স্বতন্ত্র শাসন-বিভাগ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের সময় (দ্বাদশ শতাব্দী) বর্তমান বঙ্গদেশ রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বঙ্গ জনপদের সীমানা বর্ণনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র।[৩১]

বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদের মধ্যে সুহ্ম অন্যতম একটি জনপদ। সুহ্ম নামটি প্রাচীন অনেক সাহিত্যাদিতে বহুল উল্লিখিত।[৩২] এ থেকে ধারণা করা যায় বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম পরস্পর প্রতিবেশী জনপদ। মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে ভীমের দিগ্বিজয় ছাড়াও দুর্যোধনের মিত্র কর্ণ- যিনি অঙ্গদেশের শাসনাধিপতি ছিলেন, তিনি সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গ জয় করে বঙ্গকে নিজ রাজ্যের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে ভীম বঙ্গ জয় করার পর ক্রমে তাম্রলিপ্তি, কর্বট এবং সুহ্মরাজকে পরাভূত করেন। কালিদাস রচিত *রঘুবংশে* বঙ্গ জয় করার পূর্বে রঘুর সুহ্মদেশ জয়ের কথা বলা হয়েছে। এ সব বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন সুহ্ম জনপদ সম্ভবত গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন সমুদ্র-উপকূলাঞ্চলসহ দক্ষিণতম অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হাওড়া, হুগলী জেলা ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। *বৃহৎসংহিতার* বর্ণনা থেকে দেখা যায়, সুহ্ম অঞ্চলটি বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী ভূভাগ, সুহ্ম নামটি বিভিন্ন সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময়ে এ জনপদটি তাম্রলিপ্তি নামে অধিক পরিচিত পায়। জাতকের গল্পে ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সুবৃহৎ নৌ বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বারবার তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থ এবং টলেমি, ফাহিয়েন, যুয়ান চোয়াং ও ইৎসিংয়ের বিবরণে তাম্রলিপ্তি বন্দরের বর্ণনা আছে। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রই নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও তাম্রলিপ্তি সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তীতে সুহ্ম জনপদটি রাঢ় জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[৩৩] বাংলার ইতিহাসে রাঢ় প্রসিদ্ধ একটি জনপদ। এই জনপদের উল্লেখ দেখা যায় প্রাচীন গ্রন্থ *আচারাঙ্গ* সূত্রে। সময়ের বিবর্তনে রাঢ় দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ধারণা করা যায় যে, উত্তরে রাঢ়ের সীমা নির্ণিত হতো গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহ দ্বারা এবং অজয় নদী ছিল উভয় রাঢ়ের প্রাকৃতিক সীমারেখা। ধারণা করা যেতে পরে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীর মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-হুগলী-হাওড়া ও মেদিনীপুরের কিয়দ্বংশসমূহ দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল বৃহৎ রাঢ় জনপদ। সমুদ্র উপকূলবর্তী এই জনপদটি ছিল খুব নিচু ও আর্দ্র।[৩৪] তবে এই জনপদটি পরবর্তীতে দেশবাচক নাম বাংলা বা বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

সমতট প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের 'এলাহাবাদ-প্রশস্তিতেই' সম্ভবত সমতটের নাম প্রথম দেখা যায়।[৩৫] হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায়, সমতটে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। শীলভদ্র এই বংশের

উত্তরাধিকার- যিনি নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।[৩৬] 'বঙ্গ তখন সমতটের রাজার অধীনে ছিল বলে ধারণা করা হয়। খড়্গ নামধারী এক বৌদ্ধ রাজবংশ এই ব্রাহ্মণ রাজবংশকে উৎখাত করে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ঢাকায় আশরাফপুর এবং কুমিল্লায় দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত দুটি তাম্রলিপিতে খড়্গোদ্যম, তাঁর ছেলে জাত খড়্গ এবং তাঁর ছেলে দেব খড়্গ এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। দেব খড়্গের মহিষী প্রভাবতী এবং ছেলে রাজরা অথবা রাজরাজ ভটের নামও পাওয়া যায়।[৩৭] তাঁরা ধর্মীয় দিক থেকে ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁদের রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। এদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত। এটি কুমিল্লার অদূরে কামতা বলে ধারণা করা যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চন্দ্রবংশীয় দুজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন গোপীচন্দ্র এবং লোলিতচন্দ্র।[৩৮] আধুনিক কালে ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্নখননের ফলে ও অন্যান্য তাম্রশাসন প্রাপ্তির ফলে প্রমাণিত হয়েছে, দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে কুমিল্লায় 'ময়নামতি-লালমাই' অঞ্চলকে ঘিরে চন্দ্রদেব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল এবং ময়নামতি অঞ্চল হিউয়েন সাঙ উল্লিখিত সমতট জনপদ। চন্দ্ররাজ ও পরবর্তী শাসক দামোদর দেব কর্তৃক প্রদত্ত তাম্রশাসনে সমতটের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩৯]

সুতরাং এসব তথ্য থেকে আমরা ধরে নিতে পারি মূলত মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল ও সামান্য পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ শ্রীহট্টের দক্ষিণাঞ্চল, কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমতট। সমতটের এই সীমা সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদের কোনো অঞ্চল কখনও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কখনও সমতটের কোনো অংশ হাতছাড়া হয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদ বঙ্গ হিসেবে বঙ্গের সঙ্গেই এ ধরনের ঘটনা বেশি ধারণা করা যায়। সম্ভবত এ কারণেই অনেক সময় সমতট আর বঙ্গ সমার্থক বলেও বিবেচিত হয়েছে।

হিউয়েন সাঙ সমতটের পর তাম্রলিপি হয়ে কর্ণসুবর্ণ জনপদে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান তাম্রলিপ্তি থেকে ১৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কর্ণসুবর্ণে কমপক্ষে ১০টি বৌদ্ধ বিহার বা সঙ্ঘারাম ছিল, যেখানে দু'হাজার আচার্য বাস করতেন। রাজ্যের অবস্থানিক বিবরণ সূত্রে ধারণা করা যায় বর্তমান মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের উত্তরাঞ্চল ও মালদহের কিছু অংশ নিয়ে ছিল কর্ণসুবর্ণ জনপদের বিস্তার। হিউয়েন সাঙের বিবরণানুযায়ী রাজা শশাঙ্ক ছিলেন কর্ণসুবর্ণের সম্রাট। রাজা শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। হর্ষচরিতেও তাঁকে 'গৌড়েশ্বর' অভিধায় সম্বোধন করা হয়েছে। বিধায় ধারণা করা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ প্রশাসনিকভাবে স্বাধীন থাকলেও এটি বৃহৎ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টলেমি রচিত ভূগোল-বৃত্তান্ত গ্রন্থে কর্ণসুবর্ণ জনপদের তথ্য অবগত হওয়া যায়। টলেমির বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময়ে বঙ্গদেশে কাটিসিনা (কর্ণসুবর্ণ) 'তমালতিস (তাম্রলিপ্তি) ও গঙ্গারিডি (গঙ্গারাঢ়ি) প্রভৃতি স্বতন্ত্র জনপদের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়।

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত জনৈক কান্তিদেব নামক নৃপতি প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'হরিকেল' জনপদের নাম পাওয়া যায়।[৪০] চৈনিক পরিব্রাজক ইতশিং-এর মতে হরিকেল ছিল প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত জনপদ। কবি হেমচন্দ্র হরিকেলকে বঙ্গের একটি শহর বলে উল্লেখ করেছেন। এই জনপদটি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। *মঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হরিকেল, বঙ্গ এবং সমতট তিনটি পৃথক অঞ্চল ছিল। এই তিনটি জনপদ কখনও যে একীভূত হয়নি এ থেকে তা প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের

চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকে হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অংশ বলে ধারণা করা হয়। হরিকেল শ্রীহট্ট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্ট সিলেটের পূর্ব নাম বলে স্বীকৃত।

গৌড় জনপদ প্রাচীন এবং সুপরিচিত। অবশ্য গৌড়ের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও বিস্তৃতি নিয়ে এখনও ধুম্রজাল রয়েছে। বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে গৌড় জনপদ তার পরিধি সম্প্রসারণের জন্য বাংলার বাইরেও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। গৌড়ের খ্যাতি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোনো কোনো সময় সমগ্র বাংলাই গৌড় নামে আখ্যায়িত হয়। শুধু তাই নয় পূর্ব ভারতীয় দেশগুলোর সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি আর্যাবর্ত তথা উত্তর ভারতের নাম হিসেবেও গৌড়কে চিহ্নিত করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে গৌড় বলতে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদহ জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝায়। গৌড়ের উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতকের লেখক পাণিনি গৌড়পুর নামে একটি নগরের উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী) অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, গৌড়দেশের প্রসিদ্ধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারণে। গুপ্তযুগের লেখক বরাহমিহির গৌড়ক এর উল্লেখ করেছেন। পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান থেকে আলাদা ছিল এই গৌড়ক। গৌড়ক বলতে গৌড় জনপদকে বুঝানো হয়েছে। কনৌজরাজ ইশান বর্মনের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকে) তাঁর গৌড় বিজয়ের বিবরণ রয়েছে। হড়াহা লিপি অনুযায়ী গৌড়দেশ দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে গৌড়রাজ শশাংক একজন শক্তিশালী শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বানভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে শশাংককে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করেছেন। জানা যায় শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। সেই হিসেবে অনেকে মনে করেন কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় অভিন্ন জনপদ। শশাঙ্কের আমলে গৌড় জনপদ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। দক্ষিণ বিহার ও উড়িষ্যা এর অধিভুক্ত ছিল। এ সময়ে গৌড় জনপদের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

*ভবিষ্য-পুরাণে* গৌড়ের ব্যাপক বিস্তৃতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে নবদ্বীপ (নদীয়া জেলা), শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), মৌলপত্তন (হুগলী জেলার মোল্লাই), কন্টকপত্তন (বর্ধমান জেলার কাটওয়া) পর্যন্ত একদিকে পদ্মা নদী অপরদিকে বর্ধমান পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলার পূর্বাংশ বঙ্গ এবং পশ্চিমাংশ গৌড় নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলার পালরাজাগণ গৌড়রাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেন রাজাদের উপাধি মুসলমানদের গৌড় বিজয়ের পরে পূর্ববঙ্গের রাজা সেনরাজ বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন। কলহনের *রাজ তরঙ্গিনীতে* পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। এই পঞ্চগৌড় হচ্ছে-
ক. বঙ্গদেশীয় গৌড় খ. সারসূত দেশ (পূর্ব পাঞ্জাব) গ. কান্যকুব্জ (কনৌজ) ঘ. মিথিলা (বিহারে অবস্থিত) ঙ. উৎকল (উড়িষ্যায় অবস্থিত)। পাল বংশীয় রাজা বর্মপালের সময়ে এই পঞ্চগৌড়ের প্রভাব ছিল অত্যধিক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গৌড়ের প্রাচীনত্ব ও অবস্থান এবং এর সংকোচন ও প্রসারণ সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে গৌড় পশ্চিম বাংলার অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মালদা-মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলেই ছিল গৌড়ের আদি অবস্থান। পরবর্তীকালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড় নামে পরিচিতি অর্জন করে। এমনকি আর্যাবর্তেও গৌড়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও গৌড়ের অবদান ছিল। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থাদি, খোদিত শিলালিপি ও তাম্রশাসন কিংবা চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বিবরণীতেই শুধু নয়, গ্রিক ঐতিহাসিক ও

ভ্রমণকারীদের বিবরণেও পূর্ব ভারত ও বঙ্গদেশীয় জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেও শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । সম্রাট আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের শেষদিকে পাঞ্জাবের বিতস্তা নদীর তীরে উপনীত হয়েছিলেন। সমসাময়িককালে গঙ্গাতীরবর্তী বর্তমান বিহার, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গকে নিয়ে প্রাচী ও গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গারাঢ়ি রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গড়ে উঠেছিল। নাম থেকে মনে হয় গঙ্গার তীরে অবস্থিত রাঢ়দেশই ছিল গঙ্গারাঢ়ি বা গঙ্গারিডি। হেলেনিক ইতিহাসবিদদের কথিত গঙ্গারিডি রাষ্ট্র অর্থাৎ পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গকে নিয়ে গঙ্গারাঢ়ি নামে রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অতি প্রাচীন তা অনুমিত হয়। সাম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এবং কলকাতার আশেপাশে ২৪ পরগণাসহ দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্নসন্ধান ও প্রত্নখননে প্রাপ্ত সামগ্রী থেকে এ ধারনাকে আরও সুদৃঢ় করে।

উপরের আলোচনা ও তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, ৭ম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক প্রাচীন বঙ্গদেশের সিংহভাগই অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাচীন গৌড়, দক্ষিণবঙ্গ, উৎকল এবং হয়তো বঙ্গেরও বেশ কিছু অঞ্চল তার শাসনাধীনে এনে গৌড় নামে একটি একক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর পর থেকেই বঙ্গদেশ বলতে প্রধানত তিনটি জনপদকে বুঝানো হতো। এগুলো হলো- পৌণ্ড্র, গৌড় এবং বঙ্গ। ক্রমবিবর্তনে পৌণ্ড্র নামটিও গৌড় ও বঙ্গের মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। জনপদ হিসেবে বঙ্গ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে রাখলেও প্রাচীন বঙ্গদেশ গৌড়দেশ নামে একক সত্তায় বিকশিত হয়েছিল। পুণ্ড্র থেকে সমতটবাসী সবার পরিচিতি ছিল গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় হিসেবে। পাল ও সেন নৃপতিগণ সমগ্র বঙ্গদেশে শাসন পরিচালনা করলেও নিজেদের গৌড়েশ্বর ভাবতেই বেশি গর্ববোধ করতেন। এমনকি প্রকৃত গৌড় অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েও পূর্ববঙ্গে একটি সীমিত অঞ্চলে রাজত্বকারী সেন রাজারা গৌড়েশ্বর উপাধি পরিত্যাগ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গ নামটি গৌড়ের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

মুসলিম যুগের প্রারম্ভিক স্তরে অর্থাৎ ইখতিয়ার আল-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরে মুসলিম বঙ্গের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল- বঙ্গ, রাঢ়, বাগড়ী ও বরেন্দ্র (বরিন্দ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'পুণ্ড্র জনপদ' ক্রমশ শাসনতান্ত্রিক বিভাগে পরিণত হয় এবং এর উত্তরোত্তর সীমা বৃদ্ধির ফলে সম্ভবত গুপ্ত আমলেই এর প্রশাসনিক একক হিসেবে নাম হয় পৌণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদটি ক্রমে পাল আমল থেকে বরেন্দ্রী নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাল আমলে দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র নামক জনপদের উল্লেখ দেখা যায় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *রামচরিতাম* নামক কাব্যগ্রন্থে। সেখানে কবি প্রশস্তিতে আছে-

বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চুড়ামনি: কুল স্থানম।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর প্রতিব: পুণ্য ভব্বহদ্বটু।[৪১]

*রামচরিত* কাব্যে ও কমৌল তাম্রশাসনে বরেন্দ্রীকে পালদের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। সেন ও পাল রাজাদের বিভিন্ন তাম্রশাসন ও উৎকীর্ণ লিপি থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, বর্তমান দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনার কিয়দ্বংশ নিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি গড়ে উঠেছিল। আর মুসলিম শাসনে এই বরেন্দ্রী মধ্যযুগীয় 'বরেন্দ্র' জনপদে পরিণত হয়। *তাবাকাত-ই-নাসিরী*তেও দেখা যাচ্ছে, এমনকি এয়োদশ শতকেও বাংলার বিভাগ হচ্ছে- রাঢ়, বরেন্দ্র, সনকনাট বা সমতট এবং বঙ্গ।

মুদ্রায় উৎকীর্ণ তথ্য থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে, বঙ্গ বলতে সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চল নয় একটি অংশকে বুঝানো হচ্ছে।

পাল ও সেন আমলে বাংলা নামের প্রচলন ছিল।[৪২] কিন্তু তা একটি দেশ বা জাতিসত্ত্বার পরিচয় বহন করতো না। ইলিয়াস শাহ-ই প্রথম সুলতান যার শাসনামল থেকে বাঙালি একটি জাতিসত্ত্বা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৪৩] সামগ্রিক অর্থেও বাংলা নামকরণে মুসলিম সুলতানদের অবদানই অনস্বীকার্য।[৪৪]

সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াসশাহীর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর সত্যিকার অর্থে বাংলা স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ তিনটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল। যথা-লক্ষণাবতী বা লাখনাবতী, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ। সুলতান শামস আল দীন ইলিয়াস শাহ প্রথম (১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে) তিনটি অঞ্চলকে একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'বাঙলা' বা বাঙ্গালা নামের প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকেই সমগ্র বঙ্গভাষী অঞ্চলের জন্য বাঙ্গালা নাম অপরিহার্য হয়ে যায়। *তারিখ-ই-ফিরুযশাহী* গ্রন্থে সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহকে অভিহিত করা হয়েছে শাহ-ই-বাঙ্গালা বা শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান অভিধায় এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বাংলার পাইক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানীর মতে সুলতান শামস আল-দীন ইলিয়াস শাহ-ই সত্যিকার অর্থে সমগ্র বাংলাদেশকে বাঙ্গালা নাম প্রদানের কৃতিত্বের অধিকারী, নিঃসন্দেহে তা যথার্থ।

উপরের আলোচনায় এও বলা যায় যে, পৌণ্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ-সমতট হরিকেল- এই সব জনপদ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল অতীতের বঙ্গভূমি। আর এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র জনপদ ইলিয়াসশাহী আমলে বাঙ্গালা নাম ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল আমলে আকবরের শাসনামলে প্রাচীন গৌড় বঙ্গদেশ পরিণত হল সুবে বাঙ্গালা নামে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি একক প্রশাসনিক সত্ত্বায়। আবুল ফজল তাঁর *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হলো- প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল শব্দ যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে বঙ্গাল, বা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী। এ বিষয়ে সুকুমার সেনের অভিমত হলো প্রথমে বঙ্গ থেকে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাহর নাম সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম শাসনামলে, অতঃপর পারসিক বঙ্গালহ উচ্চারণ থেকে পর্তুগীজরা বানিয়েছে 'বেঙ্গলা' এবং ইংরেজদের মুখে বঙ্গ পরিণত হয়েছে বেঙ্গল-এ। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আজ তা বাংলা। ১৯৭১ খিস্টাব্দে এর একটি অংশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে আজ তা বাংলাদেশ। চতুর্দিকে সবুজ রঙের মধ্যে লালবৃত্ত সূর্যের আকৃতির পতাকায় দেশটির নাম যুগে যুগে বাংলাদেশ নামে উচ্চারিত হবে–এ-ই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূচি:

---

১ কাজি মারুফা, *বাংলাদেশ: একটি ভৌগোলিক সমীক্ষা* (ঢাকা: সুজনেষু প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৪৯

২ *তদেব*, পৃ. ৪৯-৫৩

৩ আবু জাফর শামসুদ্দীন, "বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়", মুস্তফা নূর উল ইসলাম (সম্পা), *বাংলাদেশ:*

*বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ২৩৯-২৪০

৪ সৈয়দ আলী আহসান, "বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্ত্বা: ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, সফর আলী আকন্দ (সম্পা.) (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯১), পৃ. ৯৭

৫ *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, অধ্যায় ৭, শ্লোক ১৮; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, 2nd ed. (Calcutta, 1964), p. 1; রাখালদাসবন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩২৪ বাংলা চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৩), পৃ. ১৫; ড. আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, সফর আলীআকন্দ (সম্পা.) (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯১), পৃ. ৬৯; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ* (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ৯; B. C. Law. *Ancient Indian Tribes*, Vol. II (London: Luzac & Co., 1934), p. 2; Rajendra Lal Acharaya, *Vangalir Vala* (Calcutta: B.S. 1328), p. 5; R.C. Majumdar (ed.), *The History of Bengal*, Vol. I (Dacca: Dacca University, 1943, Second Empression, 1963), p. 7; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature* (Calcutta: University of Calcutta, 1911), p. 1; A K M Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra 1200-1576 A.D.* (Rajshahi: M. Sajjadur Rahim, 1998), p. 21 (Henceforth the Source may be referred to as *ASCV*).

৬ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, "বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা: নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী: সম্পাদনা পরিষদ অতিরিক্ত কমিশনার অব., ১৯৯৮), পৃ. ৯৯

৭ R C Majumder, *History of Bengal*, *op.cit.*, p.8.

৮ D.C Sircar. *Studies in the Geography of Anicient and Medieval India* (Delhi: 2nd Edition, 1971), pp. 36-38.

৯ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, পৃ. ৪

১০ ড. আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, পৃ. ৬৯

১১ অতুল সুর, *বাঙ্গালা ও বাঙালীর বিবর্তন* (কলকাতা: সাহিত্য লেখক, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ২৬

১২ H. S. Jarret, *Ain-i-Akbari*, Revised by J. N. Sarkar, Vol. II (Calcutta, 1948-49), p. 116; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ১৩-১৪; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস:প্রাচীন যুগ*, পৃ. ২

১৩ আবদুল মান্নান তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ২

১৫ H. Blochmann, æContribution to the Geography and History of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLII, Part I, Calcutta 1873, p. 211

১৬ ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৯

১৭ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী: সম্পাদনা পরিষদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৭

১৮ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বরেন্দ্র অঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

১৯ C. A. Lewis, æThe Geographical Text of the Puranas: A Further Critical Study", *Puranam*, Vol. IV, No. I, pp. 137-145.

২০ A. M. Shastri, *India as seen in the Brihatsamhita of Varahanihira* (Delhi, 1969), pp. 94-95

[২১] রাজসূয়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অতঃপর কৌশিকী কচ্ছবাসী (কুশিগঙ্গার তীরে) মহৌজস রাজা ও মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব রাজা এই দুই পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজিত করে বঙ্গ রাজ্যের প্রতিধাবমান হলেন।' (সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়) উদ্ধৃতি- অজয় রায়, *বাংলাদেশ: পুরাবৃত্ত* (ঢাকা: ইতিবৃত্ত পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ২২

[২২] সাইফুদ্দিন চৌধুরী, তাম্রপট্টোলীতে লাকায়ত বাংলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৭৯

[২৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

[২৪] ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ নদীটি ব্রহ্মপুত্র অথবা যমুনা বলে ধারণা করেন। আবার কেউ এটিকে ত্রিশোতা বা বর্তমান তিস্তাকে চিহ্নিত করেছেন। ১৬৬০ সালে অঙ্কিত ফনডেন ব্রোকের মানচিত্রে এই নদীটিকে করতোয়া নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

[২৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪১১বাংলা), পৃ. ৮৮

[২৬] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশ: বাঙ্গালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০) পৃ. ২৪

[২৭] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[২৮] *তদেব*, পৃ. ২৯৯

[২৯] H. E. Stapleton, æContribution to the History and Ethnology of North Eastern India", *Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* New Series, 1922, p. 410

[৩০] A. W. Botham, *Catalogue of the Provintial Coin Cabinet Assam* (Allahbad: Government Press, 1930), p. 139

[৩১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০

[৩২] C. A. Lewis, *Pranam*, IV, No. I, 137ff; D. C. Sircar, *Studies*, pp. 37; Amitabha Bhattacharia, *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal*, pp. 45-46

[৩৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১

[৩৪] মো. আবদুল জব্বার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ* (ঢাকা: সিকদার প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৫৪

[৩৫] J. Fleet, *Corpus Inscription Indicarum*, Part I, p. 14

[৩৬] ড. আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩৭] A. M. Shastri, *India as seen in the Brihatsamhita of Varahanihira* (Delhi, 1969), pp. 97-98.

[৩৮] ড. আবদুল করিম, "বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী", *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩৯] B. M. Morrison, *Political Centers*, pp. 23-24; D. C. Sircar, *Studies*, p. 149.

[৪০] A. M. Chowdhury,*Dynastic History of Bengal* (Dacca, 1967), pp.150-152

[৪১] Dr. R. C. Majumdar, Dr. Radhagobinda Basak and Pandit Nanigopal Banarji (ed. & tr.), *The Ramacharitam of Sandyakara Nandi* (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1939), p. 153

[৪২] হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, "বঙ্গ কোন দেশ", *মানসী ও মর্মবাণী*, কলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬৮

[৪৩] A. H. Dani, æShamsuddin Ilyas Shah-i-Bengal", *Sir Jadunath Sarker Commmemoration Volume,* Punjab University, 1958, p. 56.

[৪৪] B. C. Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal* (Calcutta: Calcutta University, 1942), p. 1.